রাহুগ্রাস

দিলারা হাশেম

দুপুরটা ঝিম ধরে থমকে আছে।

আমিও ; কাল রাত থেকেই।

একটু আগেই বাথ টবে ওর শরীরের নড়া চড়ায় জলের ছলাৎছলাৎ শব্দে আমার মাথার মধ্যেও একটা উথাল পাথাল হচ্ছিল।

এখন নয়। সব কিছু থম ধরে গেছে আবার। আকাশটা কড়া রোদেইস্পাতের মতো ঝলসাচ্ছে। আমি মোটা পর্দাটা টেনে আড়াল করেছিলাম। ও স্নানসেরে বেরিয়ে পর্দাটা আবার সরিয়ে দিয়েছে।

—সব সময় অন্ধকার ভলো লাগে তোমার?

আমি জবাব না দিয়ে জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়েছি।

কতক্ষণ শোবে? দুপুর তো গড়িয়ে গেছে। তবু কথাটাঅসমাপ্ত রেখে ও ড্রেসিং টেবিল থেকে নেলপলিশের শিশি নিয়ে মেঝেতে বসে পায়েরআঙুলের নখে সযত্নে নেলপলিশ লাগানোয় মন দিয়েছে। সাদা কার্পেটের পটভূমিতেওর নীল বাথ টাওএল জড়ানো শরীরটা মাতিস-এর ত্রিভঙ্গ নারী শরীরেরমতো।

আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিই। দুপুরের পর আমার করণীয়কিছু আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করি।

একটা সূক্ষ্ম সুবাস ভেসে আসছে।

ইদানীং বাথমের শেলফে নানা সৌখিন সুগন্ধি দ্রব্যের আমদানিহয়েছে যা এতদিন আমার নজরে পড়েনি। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় শাওয়ার সেরে ওরইদেয়া আফটার শেভটা খুঁজতে গিয়ে খেয়াল করেছিলাম। বাবল বাথ, শাওয়ারজেল, বডি লোশন, অডি টয়লেট, পারফিউম ভিড় করেছিল তাকে। তারইকোনো একটার ঘ্রান পাচ্ছি এখন। জীবন ধারণের মৌল প্রয়োজনের সীমারবাইরের বস্তুগুলো কি বাড়তি বিবেচনায় এতকাল আমার চোখের আড়ালেছিল? ও যে নেলপালিশ পরে তাও তো কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখে নেবার চেষ্টা করি হাতেরআঙুলে রং আছে কিনা। না, হাতের আঙুলের নখে কোনো রং এর চর্চা নেই।ওর পায়ের দিকে কোনোদিন আমি তেমন তাকাইনি।

আজ তাকিয়ে দেখলাম নারী শরীরে পদযুগলও গুত্বপূর্ণ বটে; তা নাহলে পদপল্লব নিয়ে এত কবিত্ব হত না। কিন্তু আজ ওর পায়েরগুত্ব আমার কাছে কাল রাতের পর এই প্রথম এতটা তীব্র হয়ে উঠলকেন? বুকের ভেতর খচ করে একটা ছুরির ফলা বিঁধল।

ও কি আজ পায়ের নখের নেলপালিশ চর্চার পর হাতেরআঙুলের নখও রঞ্জিত করবে? আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি পায়ের নখেরং লাগানোর শেষে ও নেলপলিশের শিশির মুখ আঁটছে।

—অত কট কট করে কী দেখছ?

ওকে যে দৃষ্টিতে বিদ্ধ করছিলাম ওর কথায় সেটা টেরপেলাম। এবারও ওর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে দৃষ্টি ফিরিয়েতাকাই বিছানার পায়ের কাছে উঁচু টেবিলে রাখা টেলিভিশনটার দিকে।হাতের কাছেই রিমোটটা থাকা সত্ত্বেও কাল রাত থেকেই ওটা চলছে। শব্দ বন্ধকরা ; শুধু ছবি। ভুলে গিয়েছিলাম অফ করতে অথবা টেলিভিশনটারঅস্তিত্ব টের পাইনি। এতক্ষণে খেয়াল হল জানালার বাইরের রোদজ্বলাআকাশটার চাইতেও ভেতরে টেলিভিশনের ছবির আলোর তেজ যেন

বেশি।রিমোটে অফ সুইচটা টিপে দিই। ও ক্লজেট খুলে কাপড় বাছছে। ঘুরেদাঁড়িয়ে বলল, বন্ধ করলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল কোর্টটিভির কড়চা।

কাল রাতের পর আমার সব কথা কি ফুরিয়ে গেছে?দৈনন্দিনের সাধারণ সংলাপেও কোনো সাড়া দেবার প্রবৃত্তি বোধ করি না। একি শুধু আমার জন্যে?

ও তো এখনও কেমন স্বাভাবিক কথার কাপড় বুনছে! সব কিছুকি তবে আগের মতোই চলবে? ঘাড়ের তলায় হাত বেঁধে বিছানায় চিতপাৎআমি চোখ বন্ধ করি।

—ঘুমুলে?

চোখ খুলে দেখি ওর দুই হাতে দুটি শাড়ি। ও কী পরবে তানিয়ে আমি কখনও কোনো মত খাটাই না। তবু ও আমাকে সাধারণতপ্রশ্ন করে।

—কোন্টা পরব?

ওর এক হাতে একটা হালকা লাইলাক কালারের অর্গ্যান্ডিঅন্যহাতে কলাপাতা-রং শিফন।

এ প্রশ্নের জবাব না দেয়াটা ইচ্ছাকৃত মনে হবে; ও আমার ভেতরের উৎক্ষেপ টের পাবে। ওকে সেই সন্তুষ্টিদিতে চাই না। নির্বিকারে বলি।

—তোমার যেটা ইচ্ছে।

ও কলা পাতা শিফন ক্লজেটে ঢুকিয়ে লাইলাক অর্গ্যান্ডি নিয়েক্লজেটের দরোজা বন্ধ করে।

—তোমারও তো কোনো ইচ্ছে থাকতে পারে?

—কিছু যায় আসে না।

আজ শনিবার। বেলে ছুটির দিনে দুজনেই বেতাম। জ্যাকসনহাইডস্ বাংলাদেশী দোকানের মাছ, চাল, ডাল, আনাজপাতি মশলা কিনতে কিনতেপথে পথে পরিচিত বাঙালিদের সাথে সাপ্তাহিক আলাপ জটলা সেরে বাড়ি ফিরেরান্না বান্না। সন্ধ্যায় কারো বাড়িতে ডিনার, নয়তো আমার এখানেই সান্ধ্যআড্ডা। জীবনের এরকম একটা ছক ছিল বটে।

শুত্রবার রাতে কম্পানির কনফারেন্স সেরে লস্ এঞ্জেলস্ থেকেফিরে আসার পর সব টিন এলোমোলো হয়ে গেছে কি? এবারে মাস খানেকের জন্যে যেতে হয়েছিল। কবে ফিরব তাবৃহস্পতিবার পর্যন্তও ঠিক ছিল না। কাজ শেষে ওর অভাব বোধ করতামপ্রতি রাতে। একটা আদিম ক্ষুধা শরীরে একটু একটু করে জমাহয়েছে একমাস ধরে। ব্যস্ততা ফুরিয়ে গেলেই যেটা আমার ভেতরে তীব্র হয়েউঠত।

টেলিফোনে কথা বলে সে ক্ষুধার তৃপ্তি হত না।

শিকাগো থেকে কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিল লোলা। স্প্যানিশমেয়ে। ছত্রিশ বছর বয়স, অবিবাহিতা। প্রজাপতির মতো ছটফটে। আমারআমেরিকান কলিগরা বলতে ‘বাব্লি’। সন্ধ্যার পর কাজ শেষে সেকারো না কারো সাথে ডিনারে যেত। কনফারেন্সের বিজনেস স্যুট ছেড়ে কাঁধখোলা হালকা সান্ধ্য ড্রেসে সজ্জিত হয়ে ফরাসি সেন্টের সুগন্ধি ছড়িয়ে সে রোজসন্ধ্যাতেই কারো না কারো সাথে বেত। আসলে তাকে বাইরে নিয়ে যাবারজন্যে আমার অন্য কলিগদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়েছিল। কিন্তু তার নজর ছিলআমার দিকে।

—হাউ কাম ইউ নেভার গো আউট ইন দ্য ইভনিং,মিস্টার হাসান?

—আই ফিল টায়ার্ড আফ্টার ওয়ার্ক।

—ডোন্ট ইউ নো টু মাচ ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লেমেকস জ্যাক এ ডাল বয়?

তার চোখের তারা আকাশের তারার মতোঝিলমিল করছিল। আমি তার এই আগ্রহে একটা অস্বস্তি বোধ করে পুষহয়েও সামান্য ব্লাশ করেছিলাম, তাতে যেন ওর আগ্রহ আরো বেড়ে গিয়েছিল।আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল,

—কাম অন, লেট আস হ্যাভ সাম ফান টু নাইট। আই উইলট্রিট ইউ ইন ডিনার।

আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম,

—ইউ আর ভেরি গ্রেশাস, মিস লোলা। বাটআনফরচুনেটলি আই অ্যাম এক্সপেক্টিং দিস্ ইমপর্টেন্ট ফোন কল ফ্রমনিউইয়র্ক। ক্যান আই হ্যাভ এ ‘রেইন চেক’?

ওর চোখের চমক নিভে গিয়েছিল।

—আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। বাট আই ডোন্টবিলিভ ইন 'রেইন চেকস্'।

এরপর ও তার এই ঝিাসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছিলতাতে ওর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু না বলা কথা ওর নিজের অনিচ্ছাতেই বেরিয়েএসেছিল এবং নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়াতে একটু আত্মসচেতন হয়েউঠেছিল।

'রেইন চেক'—অর্থাৎ বাকির খাতায় জমা রাখা।ওর সমস্ত জীবনটাই তাই। প্রথম প্রেমিক এভাবে পেছাতেপেছাতে বিয়েটাকেই 'রেইন চেক' করে ফেলেছিল। ছত্রিশ বছরবয়সেও লোলা অবিবাহিতা। সে তাই আর কিছুই বাকির খাতায় জমা রাখতেরাজী নয়। আমি যখন একটু বিমর্ষ বোধ করছি তাকে হতাশ করে—তখনলোলা হঠাৎ প্র করেছিল—

—সো হু ইজ দিস্ ইমপর্টেন্ট পারসন দ্যাট ইউ আরএক্সপেক্টিং এ ফোন কল ফ্রম। অসতর্ক ধরা পড়ে চমকে জবাব দিয়েছিলাম।

—মাই ওয়াইফ।

—ও আই সি! ইউ আর ম্যারেড? হাই কাম ইউ ডোন্টহ্যাভ এনি রিং?

বলেছিলাম আমাদের কালচারে বিবাহিত পুষের হাতে আংটিথাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

—সাম হাউ আই থট ইউ ওয়্যার আনম্যারেড, অরডিভোর্সড, অর এ উইডোয়ার। আইমিন সিঙ্গল।

—হোয়াই? বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি রিং?

—নো, ইউ সিম্পলি লুক আনম্যারেড। লোলা হেসে উঠেছিল; আমিও।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যত্ন করে শাড়ি পরতে পরতেও আমার দিকে তাকাল। মনে হয়, আমার ভাবান্তর লক্ষ করছে।

—কী ভাবছ?

বুঝতে পারি ও একটা কথোপকথন শু করতে চাইছে আমিযেটা এড়াতে চাই।

—কিছু না।

—আমার মনে হয় আমাদের ভাবতে হবে।

এই মন্তব্য করে ও নাভিমূলের নিচে বাঁধা পেটিকোটেশাড়ির কুঁচি ভাজ করে নিপুণ হাতে গুঁজতে থাকে।

লোলাকে হতাশ করার পর রাতে ওর শরীর নিয়েই কীরকম কল্পসম্ভোগ করেছি লস্ এঞ্জেল্সে ভেবে আমার ভেতরে একটাউষ্মার উদ্রেক হয়। নিজেকে একটা অকালকুষ্মাণ্ড, চরম বোকা বলেমনে হয় অবস্থার প্রেক্ষিতে। আর আশর্চ্য হয়ে উপলব্ধি করি,ব্লাউজের ও পেটিকোর্টের বাঁধনের মাঝখানে ওর উন্মুক্ত এক ফালিকোমর ও নাভিমূল এখনও আমার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলছে। শুত্রবারনিউইয়র্কের প্লেন ধরেও ওকে টেলিফোন করিনি। ইচ্ছে অবাক করে দেব।

সন্ধ্যা সাতটা আটটায় ফিরে নিজেই অবাক হয়েছিলাম।

ঘর দুয়োর অন্ধকার।

ও বাসায় ছিল না। বসার ঘরে বাতির সুইচ টিপে আরো অবাকহবার পালা।

টেবিল, সোফা, দেয়ালের ছবি, ডাইনিং টেবিলেরঅবস্থান—সব নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে। কামল হাসানের স্লান শেষে সিক্তবসনা তিন নারীর ক্যালেন্ডারের বাঁধানো ছবিটির জায়গায় ভ্যান গগের'সান ফ্লাওয়ার'-এর বাঁধানো প্রিন্ট।

কফি টেবিলের ওপর বিরাট ত্রিস্টাল-এর ফুলদানিতেলম্বা ডাঁট এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। সারা ঘর ভরে আছে তার গন্ধে।

দোকান পাটে গেলেও এতক্ষণে ও সাধারণত ফিরে আসে।অন্ধকার বেড মে ঢুকে অ্যাটাশি আর ডাফল ব্যাগটা নামিয়ে রেখেই রান্নাঘরে ফিরেছিলাম। এক মাস হোটেলের বিছানা আর বাইরে খাবার খেতে খেতেবাড়ির রান্না খাবারের জন্যে যে এতটা আনচান করছিল ভেতরটা তা বাড়িফিরেই টের পেয়েছিলাম। সংসারের কী একটা সুগন্ধ!

একেই বোধ হয় বলে 'হোম সুইট হোম'।

কিন্তু সেই পরিচিত গন্ধটা যেন এক মাসে কোথায় উবে গেছেবলে টের পেয়েছিলাম।

রান্না ঘরের মাছ রান্নার গন্ধটা কার্পেটে দেয়ালে মাখামাখিহয়ে থাকত। ঘরে ঢুকেই সব সময় নাক সিঁটকাত ও।

—আমি আর মাছ রান্না করব না কাল থেকে। আমি জবাবদিতাম না। মাছ না হলে আমার ভাত রোচে না ও জানে। বাংলাদেশী গ্রোসারি থেকে ফ্রোজেন পাবতা, ট্যাংরা, ইলিশ,ই, চিংড়ি রাশি রাশি এনে ফ্রিজ ভরতি করে রাখতাম আমিই।

প্রাণে ধরে ওগুলো কিছুতেই ও নষ্ট হতে দিতেপারে না।

রাঁধবে না বললেও ও রাঁধবে, আমি জানি। অগত্যা চেপে যাওয়াইভালো জেনে মুখে কুলুপ দিয়ে রাখি। ও রাঁধে শুধু না, ভীষণ ভালো রাঁধে।রকমারি রাঁধে। আস্ত আস্ত সবুজ বাংলাদেশী সীম ইলিশ মাছের ওপরবিছিয়ে নিচে ভাজা পেঁয়াজ মসলার ওপর ঢাকনা দিয়ে দমে রান্না মাছের গন্ধেআমার বিয়ে বাড়ির পোলাও বিরিয়ানি খেয়ে আসার পরও রসনা সজল হয়েউঠত মাছের সাথে সবুজ সবজির স্বাদু সুঘ্রাণে।

ঘরে ঢুকেই কতবার ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিআচমকা শুধু ওই সরেশ গন্ধে।

ও অবাক হয়ে বলেছে—এ কী! হঠাৎ প্রেম উথলে উঠল কেন?

ওকে মিথ্যে কথা বলেছি।

—পার্টিতে তোমাকে এত সুন্দর লাগছিল তখন থেকেই চুমুখেতে ইচেছ করছিল।

এ কথা বলেই কিন্তু রান্না ঘরে ঢুকে কড়ার ঢাকনা খুলে ইলিশমাছের গন্ধে ভরপুর নরম এক টুকরো সীম তুলে মুখে ফেলেছি যখন তখন বিরক্তমুখ ঘুরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ও বলেছে।

—পুষের মন পেতে হলে পেট পুজো করতে হয় জানি,কিন্তু খাবারের সাথে সেক্সেরও সম্পর্ক তোমাদের সেটা জানা ছিল না। রাগ দেখালেওআমি যে ওর রান্নার এত ভক্ত তাতে ও খুশি যদি না-ই হত তাহলে এত পদে পদেরকমারি রাঁধত কেন? কিন্তু কাল রান্নার গন্ধ নয়—ঘর ভরে রজনীগন্ধারসুবাস বসার ঘর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। রেফ্রিজারেটরটা খুলে মনে হল এই এক মাস এ বাড়িতে রান্না খাওয়ার পাটছিল না। খাবার মতো তেমন কিছু নজরে পড়ল না। খুঁজে পেতে একটা কনডেন্সডমিল্কের টিনে একটুখানি তলানি পাওয়া গেল। সেটা দিয়ে চা বানিয়ে খেয়েশাওয়ার নিতে ঢুকেছিলাম। ও ফিরে আসার আগে যাত্রার ক্লান্তি ও ময়লাধুয়ে ওর জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছিলাম।

যত্ন করে শেভ সেরে আফটার শেভ লাগানো তেমন অভ্যাস নাথাকা সত্ত্বেও গত জন্ম দিনে ওর উপহার দেয়া ডিটি টয়লেট থাবড়েছিলামগালে। জানি ও এটা ভালোবাসে।

শাওয়ার নেয়ার সময়ে আমার প্রতি রোমকূপে ওরশরীরের স্পর্শ-ক্ষুধা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। নিউইয়র্কে সংসারপাতার পর এত দীর্ঘ দিন এই প্রথম ওর কাছ থেকে দূরে কাটল। এতকালনিয়মিত রমণের অভ্যাস, নাকি প্রিয়ার বিরহ সেটা বুঝতে পারিনি ;শুধু উপলব্ধি করেছিলাম তীব্র কামনা হাঙ্গরের মত শরীরে দাঁত বসাচ্ছিল।

অপেক্ষা করতে করতে রাত বেড়েছিল, শরীরে কামনারআগুন নিভে পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ করে। বাড়িতে খাবার নেই। ও নেই মানে গাড়িও নেই। সবচাইতেকাছের ম্যাকডোনাল্ড মিনিট দশকের হাঁটাপথ।

অপেক্ষা আমার কাছে কষ্টকর ; কাল রাতে তাআরো অসহনীয় হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের পথে হাঁটতেবেশ ভালোই লেগেছিল। পথে পাড়ার দু'-চার জন আমেরিকান ইহুদিপরিবার আমাকে দেখে কুশল সংবাদ নিয়েছিল। ওরাই এই অঞ্চলে বেশি।

—আর ইউ অল রাইট, মিস্টার হাসান? হ্যাভন্ট সিনইউ ফর কোয়াইট সামটাইম।

—আই ওয়াজ অ্যাওয়ে। অফিস ট্রিপ টু লস্ এঞ্জেল্স।

—ওহ আই সি!

ম্যাকডোনাল্ডটায় ভিড় পাতলা হয়ে এসেছিল। হাতে ঘড়িরদিকে নজর বুলিয়ে দেখেছিলাম রাত দশটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। খদ্দেরকমে আসার কারণ বুঝতে পারি। রাত দশটায় এ পাড়ার ম্যাকডোনাল্ড বন্ধহয়ে যায়। যাক,সময় মতো ঢুকেছি, দোর বন্ধহবার আগে। ক্ষুণ্নিবৃত্তির একটা ব্যবস্থাহল যাহোক।

বসে খাওয়া গেল না, চীজবার্গারের ঠোঙ্গা হাতে রাস্তায়হাঁটতে হাঁটতে খাচ্ছিলাম, অথচ খাবারের কোনো স্বাদ মুখে লাগছিল না।

ও কোথায় গেছে, কেন ফিরছে না এত রাতেও ইত্যাকারভাবনা ও দুর্ভাবনা আমাকে এত বিস্ত্রস্ত করছিল যে খাবারের

তৃপ্তি উবেগিয়েছিল।

দু'-চার কামড় দাঁতে কাটার পর পেটের মোচড়বন্ধ হতেই আর খেতে ইচ্ছে করেনি। অর্ধেকটা চীজবার্গার সহ মোড়কটা পথেরধারে গার্বেজ বিনে ফেলে সাধারণের চাইতে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলাম। দূরথেকেই টের পেয়েছিলাম ও তখনও ফেরেনি। অন্ধকার কন্ডোটা ভূতের মতদাঁড়িয়ে ছিল। অবচেতনে বুঝি আশা ছিল ওকে ঘরে ফিরে ঘরেই পাব।

ঘরে ঢুকে আর বাতি জ্বালিনি, শোবার ঘরমুখো হতেও ইচ্ছেহয়নি। বসার ঘরের সোফাতেই শরীর ঢেলে দিয়েছিলাম। চোখে ঘুম ছিল না,ক্লান্তিও নয়, শুধু একটা বিরক্তি। অধীর প্রতীক্ষা স্তিমিতহয়ে তার জায়গায় একটা ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছিল। দূর হাইওয়েতে একটাঅ্যাম্বুলেন্সের আর্তনাদ শোনা যায়। বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। উঠে বসেজানালার বাইরে তাকিয়ে বুকের উদ্বেগটাকে আগল দেবার চেষ্টা করেছিলাম।ও একা গাড়ি নিয়ে বেলেই কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কেউ ওর 'কারজ্যাকিং' করার চেষ্টা করেছে অথবা কোনো 'মাগার'-এরকবলে পড়েছে—ইত্যাকার ভাবনায় আমি পর্যুদস্ত হয়ে পড়তাম। যারজন্যে ওর বহু ধমক খেতে হয়েছে বহুবার।

—তুমি আমার দক্ষতায় বিশ্বাস কর না। তুমি আমাকেতুচ্ছ কর মেয়ে মানুষ জ্ঞান করে। তুমি শুধু মনহুম চিন্তা কর। ভালো কিছু ভাবতে পার না।

ওর এই সব অভিযোগের কোনোটাই যে সত্য নয়— সত্য শুধুওকে নিয়ে আমার অহেতুক উদ্বেগ এ কথাটা আমি ওকে কোনোদিন বোঝাতেপারিনি।

ভেতরের অন্ধকার চোখ সহা হয়ে বিনা আলো, অথবা জানালাপথে আসা বাইরের ল্যাম্পপোস্টের ফিকে আলোতেও ঘরের ভেতরটা ধীরেধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আবার সোফায় এলিয়ে দেখতে পাচ্ছিলামক্রিস্টালের ফুলদানিতে লম্বা ডাঁট রজনীগন্ধা, দেয়ালে বাঁধানো ভ্যান গগের'সানফ্লাওয়ার'-এর প্রিন্ট, সাইড টেবিলে ল্যাম্পের ধারেহেলানো আমাদের যুগল ছবি।

ইঁট, কাঠ, ইস্পাত, কংক্রীট, স্কাইস্পোর এরনিউইয়র্কে ঠাঁই নিয়েছি দীর্ঘ বারো বছর হয়ে গেল সে কথাটা একা সোফায়শুয়ে হঠাৎ করে মনে এসেছিল। প্রথমটায় বহু ঘা-গুঁতো, সংগ্রাম,সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়েছি, টিকে থাকার জন্যে। ধীরে ধীরে শেকড়বাকড় গজিয়েছিল। ও অত জানে না, কিছুটা জানে।

ওকে নিয়ে এসেছি তাও প্রায় ন'-দশ বছর হয়েগেল। মায়ের চাপাচাপিতে তাঁদের পছন্দ করা মফস্বলের মেয়ে বিয়ে করেএখানে নিয়ে এসেছিলাম সবুজ কার্ড পাবার পর।

প্রথমদিককার কৃচ্ছ্রসাধনের স্বাক্ষর বোধ করিস্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ততদিনে টানাটানিতে টান টান থাকাহয়েছিল মজ্জাগত। তখনও এখনকার মতো সচ্ছল হয়ে উঠতে পারিনি। কম্পানির এইভালো চাকরিটা পেয়েছিলাম ওকে আনার বছর চার পর।

সেই চার বছর ওকে পাড়ার 'পিপলস্ ড্রাগ'-এরক্যাশিয়ার কাউন্টারে দাঁড়াতে হয়েছে, পেনির হিসাব করতে হয়েছে, খুলনামিউজিক কলেজের ডিপ্লোমা নিয়ে ও রান্নায় হাত পাকিয়েছে ;তানপুরায় জমেছে ধুলো।

এসব ভাবতে ভাবতে আমার বসার ঘরের কোণে নজর পড়েছিল।তানপুরাটা সেখানে এখনও একা দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়েছিলাম। কম্পানিরচাকরি ও 'কন্ডো'-টা কেনার পর ও আবার গান বাজনা শুরুকরেছিল। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ির পার্টিতে গান গেয়ে যখন অন্যদের মুগ্ধপ্রশংসা কুড়াতো তখন আমার বুকটা ফুলে উঠত গর্বে। তানপুরাটাযখন ঘরে তখন ও নিশ্চয় কোনো গানের জলসায় যায়নি। সেটা এত রাতে বাড়ি নাফেরার একটা কারণ হতে পারত, কিন্তু তা নয় সেটা উপলব্ধি করে আমারউদ্বেগ ও অস্থিরতা আরো বেড়েছিল।

পাঁচ-ছ' ঘন্টা প্লেন জার্নির ক্লান্তি এবংতারপর দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার অধীর প্রতীক্ষায় আমার চোখে হালকাতন্দ্রা নেমে এসেছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ দরজা খোলার ও বসারঘরের বাতি জ্বলে ওঠার সাথেই আমার ঘুম ভেঙেছিল।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল ওর কণ্ঠ থেকে। মুখফ্যাকাশে হয়ে কাঁপছিল ও। আর আমার নজর পড়েছিল দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

রাত দুটো।

ও জানতো না আমি ফিরেছি। খালি ঘরে বন্ধ দরোজা চাবি দিয়েখুলে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপেই ও আঁতকে উঠেছিল সোফায় কাউকে শুয়েথাকতে দেখে। ওর প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক।

আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠা হৃদপিণ্ডটা দু' হাতে চেপে ওহাঁফাতে হাঁফাতে দম নিয়ে বলেছিল,

—তুমি! একি প্র্যাকটিকাল জোক! আমার তোহার্টফেল হবার অবস্থা! এ ভাবে কিছু না জানিয়ে না বলে...

—নিজের বাড়িতেও জানিয়ে বলে আসতে হবে সেটা জানা ছিলনা।

আমি হিস হিস করে দাঁতের তলায় কথাগুলো বলেছিলাম।কেননা এতক্ষণের প্রতীক্ষা ও বিরক্তির পর ওকে ঘরে ঢুকতেদেখে খুশির চাইতে চন করে রক্ত চড়ে গিয়েছিল আমার মাথায় ওর দিকেতাকিয়ে। ওর লম্বা বেণীর জায়গায় কাঁধের ওপর ছড়িয়ে ছিল থরে থরে কাটাকেশ। পরনে একটা আঁটো সাঁটো জার্সি টপ ও স্কার্ট। ওকে চিনতে পারাই মুশকিল।তবে স্বীকার করতেই হয়, ভিন্ন বেশে ভালোই লাগছিল ওকে। আমার সেই তীব্রতিক্ত চাহনির সামনে পড়ে ও বেশ অস্বস্তি বোধ করে পাশ কাটিয়ে শোবারঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করতেই সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে খপকরে হাত ধরেছিলাম ওর। ওর বেশবাস দেখেই টের পেয়ে গিয়েছিলাম ও কোনোবাঙালি বাড়ির পার্টিতে মোটেও যায়নি।

—এত রাতে কোথায় ছিলে?

কৈফিয়তের জন্যে কথা হাতড়ালেও বেশ স্বচ্ছন্দে জবাব দিয়েছিল।

—বনির বার্থডে পার্টি ছিল।

—বার্থডে পার্টি! এত রাত পর্যন্ত?

মোচড় দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে ও বলেছিল

—এত জেরা করছ কেন? আমি কি তোমার ঘরের পোষাজীব? মানুষ না?

—মানুষ তো বটেই। মেয়ে মানুষ। এত রাতে, এইপোশাকে! নিউইয়র্কে প্রতি রাতে ক'জন খুন হচ্ছে, কত মেয়েধর্ষণ হচ্ছে—খবর রাখো?

— ননসেন্স। আমি একা যাইনি কোথাও।

— কার সাথে গিয়েছিলে সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। লুকঅ্যাট ইউ! এই পোশাকে ... এত রাতে ...!

— তুমি নিজেই তো কতবার আমাকে এ সব পরতে বলেছো; এখন আপত্তি হচ্ছে— কেন? যস্মিন দেশে যদাচার। এই পোশাকেই তো ভালো।

—আমি ছিলাম না এখানে— আমি পরতে বলার জন্যে পরলেতো আগেই পরতে। আগে তো দেখিনি কোনোদিন। চোখে ধূলো দেবারচেষ্টা করো না। কার সাথে, কোথায় গিয়েছিলে বল।

নিজের কথাগুলো নিজের কানেই কর্কশ ও আপত্তিকর শোনাচ্ছিল।আমি যে ওর বনির বার্থডে পার্টিতে যাবার কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করিনি সেটা হয়েউঠেছিল স্পষ্ট।

ওর গা থেকে সিগারেট ও ঘামের একটা বিজাতীয় গন্ধআমারনাকে ধাক্কা দিচ্ছিল।

এ গন্ধ আমার পরিচিত। ওকে বিয়ে করে এখানে আনার আগেকাজ শেষে একা গিয়ে বারে বসেছি অনেকবার। এ গন্ধ শুঁড়িখানার এ আমি চিনি।ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেছিলাম।

—মদ খেয়েছ তুমি। তুমি বারে গিয়েছিলে। আমার কাছেলুকিও না।

আমার মাথার মধ্যে একটা দানব দাপাদাপি করছিল। ও একঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করেবলেছিল,

—হ্যাঁ, খেয়েছি মদ। তুমি মদ খেলে দোষ নেই আর আমিখেলে সেটা অন্যায়?

ওর ওপর এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়ে হুংকার দিয়েউঠেছিলাম।

—মদ খাওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু রাত দুটোর সময়ে একামদ খেয়ে বাড়ি ফেরাটা অন্যায়।

—একা যাইনি বলেছি তো।

—কার সাথে গিয়েছিলে সেটা বলনি এখনও।

আমার বক্তব্য দৃঢ়।

আমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ক্রোধে উত্তেজনায় ওকাঁপছিল।

—তোমাকে সব কথা বলতেই হবে এমন কোনো দাসখত লিখেদিইনি আমি। বেশি জোর খাটিও না।

—কি করবে জোর খাটালে?

—পুলিশ ডাকব।

এই জবাব শুনে মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়েছিল আমার। আমি বুঝতেপারছিলাম আমি সত্যিই ওর ওপরে জোর খাটাতে পারব না। কিন্তু সেইমুহূর্তে ওর চ্যালেঞ্জের একটা জবাব দেবার অযৌক্তিক তাগিদে কোণায় ঠেস্‌দিয়ে দাঁড় করানো তানপুরাটা তুলে এক আছাড় মেরেছিলাম। আর সেটা ভাঙার শব্দের সাথেই একটা আর্তনাদবেরিয়ে এসেছিল ওর কণ্ঠ ফুঁড়ে। যেন ওর বুকটাই ভেঙে গিয়েছিল আর আমারজোর খাটাবার সব ইচ্ছে উবে গিয়ে অসহায় শিশুর মতো মেঝেতে কার্পেটেরওপর ধবসে পড়েছিলাম একটা বুক ভাঙা কান্না আমারও গলায় টাটিয়েউঠেছিল।

কিন্তু ও ততক্ষণে 'নাইন ওয়ান ওয়ান' ডায়ালকরেছে।

মিনিট দুই-এর মধ্যেই পুলিশ নক করেছিল দরজায়। আমিবিশ্বাস করতেই পারছিলাম না যে ও সত্যিই পুলিশ ডেকেছে। দরজা খুলেদিয়েছিল ও, পুলিশের জেরার জবাব দিয়েছিল ও-ই। ভাঙা তানপুরাটা দেখিয়েঠাণ্ডা গলায় বলেছিল,

—হি বিকেম ভায়োলেন্ট।

—ডিড হি হিট ইউ?

—নো, হি ডিডন্‌ট। বাট আই বিকেম স্কেয়ার্ড।

—ওয়াজ হি ভায়োলেন্ট এনি টাইম বিফোর?

—নো।

—ডু ইউ ওয়ান্ট আস টু টেক হিম অ্যাওয়ে?

এই প্রশ্নের পর আমার শরীরে শীতল আতঙ্কছড়িয়ে পড়েছিল। ফরিদপুরের কাজী বাড়ির সৎ পিতার পুত্র নিউ ইয়র্কেপুলিশের হাতে পড়বে। হাত কড়া পরিয়ে আমাকে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়েযাবে তাহলে? জানালা খুলে প্রতিবেশীরা দেখবে! আমার বুকের স্পন্দন থেমেগিয়েছিল এক মুহূর্ত।

মাথা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ক্ষণিক আমার চোখের সাথে দৃষ্টি মিলেছিল ওর। ও পুলিশকে বলেছিল।

—দ্যাট উইল নট বি নেসেসারি।

—আর ইউ শিওর?

—ইয়েস।

—উইল ইউ বি অলরাইট?

—আই থিঙ্ক সো।

—ওকে। টেক কেয়ার।

পুলিশ কর্তব্য সেরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে অনেক খুন-খারাবির মোকাবিলাকরে ওরা। এটা সেই তুলনায় তাদের কাছে তুচ্ছ। এর বেশি তাদের করণীয়কিছু ছিল না। আমার ভেতরে ততক্ষণে রাগের স্থাননিয়েছিল তীব্র অনুতাপ। সমস্ত পরিস্থিতিটার জন্যে নিজেকেই দায়ীকরে হাঁটুতে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলাম।

ও কাছে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিল,

—আই অ্যাম সরি। তানপুরাটা ও ভাবে না ভাঙলে পুলিশডাকতাম না।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম,

—আমারই অন্যায় হয়েছে, নতুন তানপুরা আনিয়ে দেব।প্লীজ মাফ করো।

ও কোনো জবাব দেয়নি। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টাওকরেনি। আর ওর শরীরের স্পর্শে সারা সন্ধ্যার ওত পাতাপ্রতীক্ষাক্রুদ্ধ অজগরটা ফণা তুলেছিল মুহূর্তে। কোনো সন্দেহসঙ্কোচ আর বিব্রত করেনি। আমি ওকে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে

ওরহালকা শরীরটা কোল পাঁজা করে তুলে এনে বিছানায় ফেলেছিলাম ;ক্ষুধার্ত বাঘের মত তছনছ করেছিলাম ওর শরীরটাকে।

টের পেয়েছিলাম ওর তরফে কোনো সাড়া ছিল না। নিস্পন্দ,নিত্তাপ, প্রাণহীন একটা পুতুলের মতো আমার ভালোবাসার অত্যাচারশুধু সহ্য করেছিল যেন।

আমার ভেতরে এক মাসের জমে থাকা অদেখার অতৃপ্তি বুদ্বুদতুলছিল, কথা বলতে ইচ্ছে করছিল খুব। কিন্তু আমার দিকে পিঠ করে পাশফিরেছিল ও। কোনো কথা বলেনি। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হলে আমি ওরকাঁধে হাত রেখেছিলাম।

—রাগ করেছ?

প্রকৃত অনুতাপে বিগলিত হয়েছিলাম আমি।

—না, রাগ করব কেন? রাগ তো তুমি করেছ।

—করেছিলাম। এখন আর রাগ নেই।

—তানপুরা ভেঙে রাগ নেমেছে বুঝি?

ওর গলায় একটু শ্লেষ।

—না, তানপুরা ভেঙে রাগ নামেনি দুঃখ হয়েছিল।

রাগ নেমেছে তোমাকে পেয়ে। সন্ধ্যা থেকে ও ভাবে অপেক্ষাকরতে হলে তুমি বুঝতে ...

—অপেক্ষার তুমি কী জান!

হেঁয়ালির মতো শুনিয়েছিল ওর জবাব। আমি কিছু বলার আগেই সে যোগ করেছিল,

—তোমার তো শুধু একটাই অপেক্ষা, একটাইচাওয়া। ইঙ্গিতটা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হয় নি। এ খোঁচা আমাকেআগেও শুনতে হয়েছে। কিন্তু কাল রাতে তার প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। ওসেই বাক্যটি উচ্চারণ করে বড় করে একটাশ্বাস ফেলেছিল। আর ওর কাঁধেহাত রেখে আমি টের পেয়েছিলাম ওর শরীরটা মুহূর্তে বাতাস বের করেদেয়া চুপসানো একটা বেলুনের মতো হয়ে পড়েছিল। আমি উঠে বসে ঝুঁকেপড়েছিলাম ওর মুখের ওপর।

—আর তোমার? তোমার কোনো প্রতীক্ষা নেই? ছিল না?

—থাকবে না কেন? আমার সারা জীবনটাই তোপ্রতীক্ষা।

একটা টক ঢেকুরের মতো উঠে এসেছিল ওর কথাগুলো।এ সংলাপ বেশি দূর গড়ানোয় মঙ্গল নেই জেনেও নিজেকে সংযত করতে পারিনি।

—কিসের প্রতীক্ষা তোমার?

স্পষ্ট জবাব ।

—যা চেয়েছি।

—কিছুই পাওনি আমার কাছে?

—নির্মম ঠাণ্ডা গলায় ও বলেছিল, যা চেয়েছি তার কিছুইপাইনি। এই জবাব শুনে আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেইচুপ। বিছানায় যেন হাজার বছর আগের মিশরের দুই মমি। একটু পর ও উঠেবসেছিল। জার্সি টপ টান করে বাথমে গিয়ে স্কার্ট পাল্টে একটা ঝোলানাইট ড্রেস পরে আবার এসে শুয়েছিল আমার পাশে। আমি কোনো সাড়া দিইনিআর। নিষ্পন্দ শুয়ে শুনেছিলাম ও কথা বলছে। আমি উৎকর্ণ, নিশ্চুপ।

—কার সাথে কোথায় গিয়েছিলাম শুনবে?

আমি চুপ।

—তুমি কি জানো আমার ঘাড়ের পেছনে একটা কালো তিলআছে?

আমি মনে করতে পারি না। ওর শরীরকে অন্ধকারে হাতড়ানোছাড়া আর কিছু আমি আবিষ্কার করিনি। ও আমার হাতের স্পর্শে একটা চেনামানচিত্র। যাকে আমি অন্ধকারেও চিনে নিতে পারি। কিন্তু ঘাড়ের পেছনে কালোতিল? মনে পড়ে না।

—আমি জানি, তুমি জানো না যে, আমার নাভির পাশেএকটা জন্মদাগ আছে, তিন পাপড়ি ফুলের মতো।

ওর বর্ণনা শুনে মনে হয় আর কারো দৃষ্টির ছবি ও নতুনকরে আঁকছে। আমার অনুভূতিতে অ্যাসিডের জ্বালা, একটু একটু করেপুড়ছিলাম।

—তুমি কি জানো আমার পায়ের পাতায় চুমো দিলে,আমার পায়ের আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়ালে আমার সারা শরীর শিউরেওঠে ; আমি সব প্রতিরোধ হারিয়ে ফেলি ?

আমি স্তব্ধ, পাথর।

ও বলে চলে,

—আমিও জানতাম না। এখন জানি।

ও এত কথা বলতে পারে, এত স্পষ্ট করে প্রকাশকরতে পারে সেটাও তো আমার এতকাল অজানা ছিল। ও কার সাথে গিয়েছিল, কীভাবে এই অভিজ্ঞান অর্জন করল তা জানার জন্যে প্রশ্নগুলো লাভারমতো ফুটছিল আমার ভেতরে। তবু আমি রা করিনি। কেননা জানার সাহস ছিলনা আর। না জানার আড়ালই মনে হয়েছিল ভালো। ও কিছু সময় চুপ করে থেকেআবার বলেছিল—

—লুকোবার আর কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয়না। আমি সম্পর্কে সততায় বিশ্বাস করি। কিন্তু এতকাল আমি সততা নয়,অভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছি। সেটা আর চাই না। তুমি লস্ এঞ্জেল্সে যাবার আগেথেকেই আমি ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। কানের কাছে যেন একটা বিস্ফোরণ।

—রবার্টকে তুমি চেন।

চিনি বইকি। নীল চোখ, এক মাথা বাদামি চুল। ওর চাইতেমাথায় ফুট খানেক লম্বা। দোহারা গড়ন। প্রতিবেশী বনিদের বাড়িতে একপার্টিতেই পরিচয় হয়েছিল। বনির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কম কথা বলে।কিন্তু চোখ দুটি অন্তর্ভেদী। ওর দৃষ্টির তলায় যে কেউ এক্সরেরতলায় পড়ার অনুভূতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রথম দিন ওর দৃষ্টিপড়েছিল আমাদের দুজনের ওপরে। আমি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। শুনতেপেয়েছিলাম ও বলছে,

—লং আইল্যাণ্ডে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

আমি যেন ‘ডেথ রো’-র আসামীর মতস্ট্র্যাপ দিয়ে হাত পা বাঁধা অন্তিম শয্যায় শোয়া। ইন্ট্রাভেনাসবিষ ফোঁটায় ফোঁটায় প্রবেশ করছে আমার শরীরে। আমার দিকেপিঠ ফিরিয়ে রেখেই ও কথা বলে চলে আরো ; আমারপ্রত্যুত্তর বা সাড়ার অপেক্ষা করে না।

—মস্তবাড়ি। বিরাট লাইব্রেরি, প্রশস্ত মিউজিক রুম। কাঠের ডান্সফ্লোর। আমি জানতাম না ও পিয়ানো বাজায়. পিয়ানো বাজিয়েছিল ও আমারজন্যে। তার পর রেকর্ড প্লেয়ারে চড়িয়েছিল ‘নক্টারন’ আমি জানতাম না সুর এ ভাবে মন ও শরীরের ওপর প্রভাব রাখতে পারে।অনেকক্ষণ দুজনে ‘নক্টারন’ এর রোমাঞ্চকর সুরের সাথে স্লোডান্স করেছিলাম। পাশেই ওর মিউজিক রুমের ওয়েট বার। না, বারে যাইনি,আমি। ওর সেই ওয়েট বারে বসেই আমরা ‘শার্ডনে’ সিপ করেছিলাম।

ও যেন সেই অনুভূতির স্রোতে ভাসছিল। আমি নীরব।

—আমার শরীরেরসমস্ত তন্ত্রীগুলো যেন একটু একটু করে শিথিল হয়ে পড়ছিল ;সুরের সম্মোহন ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরের পরতে পরতে। ও আমারচুলগুলোকে সরিয়ে আমার গলার পেছনের তিলটার ওপর ওর সিক্ত ঠোঁট রেখেছিল। আমি কি ওকে থামতে বলব?মুখ চেপে ধরব ওর? আমি আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম ওর এই অকপটেস্বীকারোক্তি, এই অনুপুঙ্খ বর্ণনা আমাকে মোটেও ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত করছিলনা। তার পরিবর্তে একটা কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে অবশ হয়ে পড়ছিলাম আমি।

যদি ও আমাকে কিছু নাবলত, যদি ও কার সাথে কোথায় গিয়েছিল, কী করেছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণঅন্ধকারে রাখত আমায়, আর আমি জেলাসিতে অন্ধ হয়ে ক্রমশ শানানো তলোয়ারহয়ে উঠতাম, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওকে ছিন্ন ভিন্ন করার ইচ্ছে হতআমার, আমার মাথার ভেতরে চিন্তার কুঠুরি গুলো দরজা বন্ধকরে দিত—তাহলে?

তাহলে আমি পাগল হয়েযেতাম। ইংরেজি ‘জেলাসি’-র কোনো বাংলা প্রতিশব্দে আমিএর সত্যিকার পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারি না। ‘হিংসা’ ঠিকসেই অনুভূতির অনুরণন তোলে না। ও আমাকে সেই পরিণাম থেকে অব্যাহতিদেয়ায় আমি

বাস্তবিকই ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম। ও এর পরঅদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল, যে প্রশ্ন একমাত্র অন্তরঙ্গবন্ধুর কাছেই শুধু করা যায়।

—হ্যাঁগো—প্রথম মদ খেলে যে এমন অজাগতিক অপূর্ব অনুভূতি হয় তুমি তোআমায় কোনোদিন বলনি। তুমি তো মদ খেয়েছ।

আমি মদ খেয়েছি ওকে ঘরেআনার আগে। ইদানীং সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। আমার ভয় ছিল মদ খেয়ে আমি নিজেরওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলব নিউইয়র্কে একা থাকার সময়ে যা বার কয়েকঘটেছে। যার জন্যে আমি আমার একাকিত্বকে দায়ী করলেও আমি জানতাম বারেগিয়ে নারী সান্নিধ্যে মদের প্রভাবে না হলে আমি নিজের ধর্ম, আদর্শ ওনীতিকে বিসর্জন দিতে পারতাম না।

আমি মদ ছেড়েছিলাম শুধুনয়, ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। নিজেকে সুরক্ষার জন্যেই নয়, ওকেভালোবাসি বলেই। ওর প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই ছিল আমার প্রধানলক্ষ্য।

নিজে মদ ছেড়েছিলাম এবংওকেও মদ খেতে বারণই করে এসেছি। ওর কথায় মনে হয়েছিল ভুল করেছি কি?

ও আমার সাড়া না পেয়েআবার খেই ধরেছিল তার বর্ণনার।

—অনেকক্ষণ বারেবসে শার্ডনে সিপ করার পর রবার্ট আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়েবসেছিল। বার টুল থেকে আমার ঝুলন্ত পায়ের পাতা দুই হাতে তুলেনিয়ে ও আমার পায়ের প্রতিটি আঙুলে চুমো খেয়েছিল।

ওর কথা আমি আর শুনতে পাচ্ছিলাম না অথবা আমার শ্রবণওনিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছিল। আমি মৃত্যুর মতো ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম।সে ঘুম একটু বাদেই যখন ভাঙল তখন ও বাথটবে স্নানরতা।

বেডমে বড় ড্রেসিং টেবিল।

কিন্তু ও বোধহয় অস্বস্তি বোধ করেছে আমার সামনে নিজেকেসাজাতে। বাথমে গিয়ে প্রসাধন ও চুল গুছানো সেরে ঘরের দরজায় এসেদাঁড়ালে তাকাতে হল।

লাইলাক অর্গ্যান্ডিজড়ানো ওর শরীরটা পবিত্রতারপ্রতিমা মনে হয়। স্নান স্নিগ্ধ, সুবাসিত, চর্চিত নিপম ;ব্যভিচারিনী নয়—মনে হয় পূজারিণী। ঘাড় ছোঁয়া চুলে ক্লিপ দিয়েদুটি রজনীগন্ধাও গুঁজেছে।

আমার দৃষ্টি বোধকরি ফুল দুটির ওপর ন্যস্ত ছিল,আমি জানি না। ও লক্ষ করে বাঁ হাতে ফুল দুটি ছুঁয়ে বলল,

—আমার জন্মদিনে রবার্ট পাঠিয়েছিল।

আমি লস্ এঞ্জেল্সে থাকার সময়ই ওর জন্মদিন পার হয়েছেবটে আমি কল করেছিলাম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ; কিন্তু রবার্টপাঠিয়েছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। খুঁজলে সবই পাওয়া যায় নিউইয়র্কে।বাংলাদেশের রজনীগন্ধাও। সেই রজনীগন্ধার সুবাসে আমার ঘর ভরে আছে এখন।

আমি বোবা তাকিয়ে থাকি। কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে,আদৌ ফিরবে কিনা ইত্যাকার বহু প্রশ্ন মাথার মধ্যে মৌমাছির মতোহুল ফুঁটাতে থাকে কিন্তু ঠোঁট পেরিয়ে একটিও বেরোয় না।

—গাড়ি রইল। তোমার লাগবে।

'তুমি কীভাবে কোথায় যাচ্ছো 'এই প্রশ্নমনের মধ্যে নিয়ে আমি নির্বাক তাকিয়ে থাকি। ও বলে,

—আমি 'মেট্রো' নেব।

'মেট্রো' অর্থাৎ পাতাল ট্রেন আমাদের বাসা থেকেবেশ দূর। অতদূর ও কখনও হেঁটে যায় না।

—বিকেলে ফুলগুলোর পানি বদলে দিও।

ড্রেসিং টেবিল থেকে ব্যাগটা নিয়ে কাঁধে ফেলে ও বেবারউদ্যোগ নিয়ে ঘুরে তাকায় আমার দিকে। ওর ভেতরে অনেক পরিবর্তন খুঁজিকিন্তু কিছুই পাই না।

ও একটু ইতস্তত করে। তারপর বসার ঘরে বেবারদরোজামুখো চলতে চলতে বলে,

—আমাদের ভাবতে হবে। কথা বলতে হবে। দরজা বন্ধকরারশব্দ পাই।

যেন নিজের অজান্তেই জানালায় গিয়ে দাঁড়াই আমি। দেখতেপাই রিনার লাইলাক অর্গ্যান্ডি জড়ানো শরীরটা দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছেদ্রুত পায়ে।

একটা বিমান আকাশে বিন্দু হয়ে বিলীন হয়ে যাবার মতো ওহারিয়ে যাচেছ। ও বলে গেল— আমাদের ভাবতে হবে, কথা বলতে হবে।

কিন্তু আমার মাথার ভেতরটা শূন্য মনে হয়, কিছুই ভাবতেপারি না।

নিউইয়র্কের জুলাই মাসের গরমে তপ্ত কটাহের মতোআকাশটায় হঠাৎ কোন্ দূরান্তের শ্যামলিমা ছায়া ঘনায়।

ফরিদপুরের অজ গ্রামের ছায়াচছন্ন ছোট পুকুর, বাঁশেরবেড়া ঘেরা ছনের বাড়ি, লাউ-এর মাঁচা, লেপা-পোঁছা উঠোনে মাকেবড়ি শুকোতে দিতে দেখতে পাই।

ঝোপঝাড় থেকে উঠে আসে টুনটুনি পাখির ডাক। আমিবিছানায় ফিরে গিয়ে উপুড় হয়ে অনুভব করি মায়ের কোলের স্পর্শ আরগন্ধ।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home